বেসাতি

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

ভীষণ বর্ষার দিন।

নিরুপমার জ্বর আজ ক'দিন ছাড়ে না। শিউলিপাতার রস খাওয়ালাম, দোকান থেকে পাঁচন এনে খাওয়ালাম, অসুখ কিছুতেই সারে না। স্কুলের ছুটি হওয়ার সময় রোজ ভাবি আজ বাড়ি গিয়ে দেখবো নিরুপমার জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। রাস্তা থেকে চেয়ে দেখি জানলা দিয়ে কি দেখা যাচ্চে—নিরুপমা বিছানায় উঠে বসেচে, না শুয়ে আছে?

রোজই নিরাশ হই। নিরুপমা শুয়ে আছে। ছটফট করচে, এপাশ ওপাশ করচে। মস্ত লেপমুড়ি দিয়েচে দেখলেই বুঝতে পারি ওর খুব জ্বর এসেচে।

সামান্য মাইনের মাস্টারি করি, এগারোটি টাকা মাইনে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকি বাড়িতে। কায়ক্লেশে চলে। পৈতৃক আমলের ধানের জমিতে যদি দুটো ধান না হোত, তাহলে সংসার একেবারেই চলতো না। নিরুপমা গোছালো গৃহিণী, যা আনি বেশ চালিয়ে দেয়। মাছ মাংস যুদ্ধের বাজারে আমাদের ঘরে আসা মুশকিল। হাট থেকে চাঁদা মাছ, চুনোপুঁটি কিনে আনি। আমাদের স্কুলের বুড়ো পণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্যি মাছ ভিক্ষে করে মেছো-হাটায়। দোষ দিইনে ওকে, মাইনে পায় সাড়ে তিন টাকা। হ্যাঁ, সাড়ে তিন টাকা! বিশ্বাস করা মুশকিল হয় জানি, কিন্তু এই সাড়ে তিন টাকার জন্যে বুড়ো কেশব ভট্টাচার্যি দু'মাইল দূরবর্তী তালকোণা-নকিবপুর গ্রাম থেকে দশটায় আসে, চারটেয় ফেরে।

কেশব পণ্ডিত মেছোহাটায় গিয়ে বলে—ওগো ও অক্রুর, তোমার নাতির দিকে একটু লক্ষ্য রাখবা। বেশ নামতা পড়তো— আজ দু'দিন আবার একটু ঢিল দিয়েচে। বলি ও কি মাছ? ট্যাংরা? দাও দিকি দুটো বাপু। তোমার নাতির কল্যেণে একদিন মাছ খেয়ে নিই। ভারি বুদ্ধিমান নাতি তোমার, হীরের টুকরো—দ্যাও ওই চিংড়ি মাছটাও দ্যাও ওই সঙ্গে। পয়সা দিয়ে তো কিনবার ক্ষ্যামতা নেই।

আমি একদিন বলেছিলাম—পণ্ডিতমশাই, মাছ আমি কি দুটো চাইলে পাইনে? পাই। কিন্তু আমার পিরবিত্তি হয় না—আপনি রোজ রোজ কেন চান?

—না চেয়ে ভায়া করি কি! বাড়িতে তিনটে নাতি, দুটো নাতনী। মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হোল, কেউ নেই সংসারে। আমি সব নিয়ে আগলে আছি। ওই সাড়ে তিন টাকাই আমার কাছে সাড়ে তিন মোহর—

—আপনার জামাই কতদিন মারা গিয়েচে?

—তা আজ হল সাড়ে তিন বছর ?

—সংসারে কে আছে?

—আমার মেয়ে নুটু আর তার কাচ্চাবাচ্চা। ওদের কেউ দেখবার থাকলে আমি কি আর ওদের নিয়ে বসে থাকি? আমারও বাড়ি কেউ নেই। বলি আগলে না রাখলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মেয়েডা কি ভেসে যাবে? তাই পড়ে আছি।

—আর কোনো আয় নেই?

—মাঝে মাঝে পুজোটা-আসটা করি, কলাটা মুলোটা সিকিটা দুয়ানীটা এই আয়। তাতে কি হয়? এক বেলা খাওয়া হয়, এক বেলা হোলই না। মাছ ওরা খেতেই পায় না। কিনবার তো পয়সা জোটে না। কোনো রকমে চালানো। আমি মাছের ভক্ত নই, ওই ছেলেমেয়েগুলোর জন্যি।

পাঠশালার মাস্টার পণ্ডিতদের অবস্থার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ত্রৈমাসিক সাহায্য আজ ছ'মাস বন্ধ। ছাত্রদত্ত বেতন সবাই মিলে ভাগযোগ করে নিয়ে কোনো রকমে চলচে।

কেশব ভট্চায্যির মাছ ভিক্ষে নিতান্ত হীন কাজ। তবে বেগুনটা, থোড়টা, মোচাটা এ আমরাও নিয়ে থাকি। স্কুলে সবই চাষিগৃহস্থদের ছেলেমেয়ে। আমি জানি জেয়ালা বল্লভপুরের পতিরাম কাপালীর মোটা চাষ আছে

তরকারির, প্রধানত বেগুনের। সেদিন তার মেয়ে লক্ষ্মী আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্লে—ও মাস্টারমশাই, আমারে কাগজ কিনে দেন না—

—কি কাগজ?

—লেখবার কাগজ।

—টাকা কে দিয়েচে?

—মোর কাছে ছেল। আরো আছে—

—বলিস কি? কটা?

মেয়েটা একটা বার্লির খালি টিন উপুড় করে ঢাললে। টেবিলের ওপর। আঠারোটা টাকার নোট, সিকি দুয়ানি, কাঁচাটাকা। টিনটা ঢেলেই বল্লে—আপনি নেন মাস্টারমশাই, এগুলো সব নেন। খাবার কেনবেন। মুই কাপড়জামা কেনবো, গজা কেনবো, মুড়কি কেনবো—

আমি ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে বল্লাম—থাম, চুপ কর। এত টাকা তুই পেলি কোথায় আগে বল্। দুটি মেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—মাস্টারমশাই, লক্ষ্মী আমাদের একটা করে পয়সা দিয়েচে জলখাবার খেতে—।

আমি বল্লাম—নিয়ে আয় সে পয়সা আমার কাছে—নিয়ে আয়—অমনি মেয়েদুটি দুটি চকচকে আধুলি নিয়ে এসে আমার টেবিলে রেখে দিল।

—কি সর্বনাশ। এরে পয়সা বলে? হ্যাঁরে, এ কি জিনিস?

মেয়ে দুটি অপ্রতিভমুখে এ ওর দিকে চাইতে লাগল।

—বল্ এ কি জিনিস? পয়সা এর নাম?

ওরা নির্বাক। একজন সাহস সঞ্চয় করে আমার দিকে বিজ্ঞের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—মাস্টারমশাই, আমি বলবো?

—বল্ না।

—নোট মাস্টারমশাই।

—নোট ? নোট মানে কি?

—তবে সিকি?

—না, এর নাম আধুলি—আট আনা। এক টাকার অর্ধেক। —যা বসগে যা—

পতিরামকে খবর দিয়ে আনিয়ে তার পরদিন সব টাকা তার হাতে দিয়ে দিতে, সে মহা সন্তুষ্ট হয়ে বল্লে—হতভাগা মেয়েটা আমার বালিশের তলা থেকে টাকার থলি চুরি করেছিল মাস্টারমশায়। গরিবপুরের হাটের পটল বেচার টাকা, উনিশ টাকা সাত আনা। খুঁজে আর পাইনে। পরিবার বলে আমি জানিনে। ভাইপো বলে আমি জানিনে। তবে একমুঠো টাকা নিলে কে? এখন জানা গেল ওই হতভাগা ছুঁড়ি টাকাগুলো সব নিয়ে চলে এসেছিল—হতভাগা ছুঁড়ির হাড় এক জায়গায় আর মাস এক জায়গায় করবো আজ বাড়ি গিয়ে।

—না বাপু, ও অবোধ মেয়ে, ওর কি সে জ্ঞান আছে? নইলে আধুলিকে কখনো বলে নোট, কখনো বলে সিকি! সে জ্ঞান নেই। মারধোরের দরকার নেই। মুখে শাসন করে দিয়ো—ইয়ে, পটল কি রকম হোল এবার?

—তা মাস্টারমশাই মন্দ নয়। হাটরাহাট দু'মণ আড়াইমণ। পাঁচ কুড়ো ভুঁই শুধুই পটল করা হয়েছিল এবার।

—একদিন দুটো পটল খাওয়াও তোমার ক্ষেতের। শুনেছি তোমার ক্ষেতের পটল নাকি বড় ভালো—

পতিরাম খুশি হয়ে উৎসাহের সুরে বল্লে—হাটের সেরা পটল মাস্টারমশাই। ওই নতিডাঙা থেকে বিলের পটলের লত এনেলাম। যেমন পাতলা খোসা, তেমনি মিষ্টি। লতও খুব তেজী, এক এক লতে পাঁচপণ করে উদ্ধ-সংখ্যে। ভাবুন সে জিনিসটা কি।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার ফলন!

—এক একটা লত দশহাত বারোহাত লম্বা। বল্লি ভাবলেন গল্পকথা বলচে, তা নয়, পতিরাম জানে পটলের চাষ কি করে কত্তি হয়। লত পুঁতলিই কি পটল ফলে? ওর কারকিৎ চাই। কাল পাঠিয়ে দেবো দু'সের পটল, খেয়ে দ্যাখবেন আপনি। না, দাম দিতি হবে কেন আপনার ও কথাই তোলবেন না। ফি হাটে যা পারি পটল আপনি নেবেন, দাম দিতি হবে না।

আমরা এইরকম করেই চালাই সংসার। একথা অস্বীকার করতে চাইনে।

কিন্তু এবার নিরুপমার অসুখ নিয়ে বড় ফেরে পড়ে গেলাম। ওর অসুখ একইরকম চলচে, বাড়েও না কমেও না। রোজ রোজ স্কুল থেকে ফিরে মনটা এমন দমে যায়!

তারপর কি, আমাদের গ্রামে পরস্পরে সহানুভূতি নেই আদৌ। আমার বাড়ি এই যে অসুখ, এই যে নিরুপমা সারাদিন বিছানায় একা পড়ে ছটফট করে (আর কোনো লোক নেই আমার পরিবারে), কেউ উঁকি মেরেও দেখবে না। আমি যে গরিব, যদি বক্সীদের মতো কিংবা নিতাই হালদারের মতো অবস্থা হোত—আমাকে সাহায্য করবার লোকের কিছুমাত্র অভাব ঘটতো না। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুখে কে আসবে? স্কুলে যে ক'ঘণ্টা থাকি, ওর জন্যে মনটা এমন উতলা হয়! এমন একটা গভীর অনুকম্পা হয়, দুঃখ হয় ওর কষ্ট দেখে! নিরু খেতে ভালোবাসে কিন্তু খেতে পায় না, পরতে ভালোবাসে কিন্তু একখানা পারিজাত শাড়ি (তাও ছ'বছরের পুরানো) ছাড়া আর কোনো ভালো কাপড় নেই ওর—কোনো সাধ মেটাতে পারিনি আমি।

আমায় কতদিন থেকে বলচে—আমায় একটা ব্লাউজ কিনে দেবে? আমার মোটে নেই—

সেদিন, আজ মাস দুইয়ের কথা, একদিন বল্লে–হ্যাঁগো, শোনো, একটা সাধ—একখানা ভালো শাড়ি পরি।

—কি শাড়ি?

—রঙিন শাড়ি। ওদের বাড়ির একটি বৌ, রাণাঘাটে বাড়ি; পরে এসেছিল—ওই রকম একটা—

বলেই যে লজ্জা সঙ্কোচের হাসি হাসে। জানে সে-ও যে হবে না কোনোদিনই, যুদ্ধের বাজারে বিশ-ত্রিশ টাকা দামের রঙিন শাড়ি কেনা, তবুও বলে। আমার সোজাসুজি বলতে বাধে, কষ্টও হয় যে দিতে পারবো না–সুতরাং বলি— দেবো, ঠিক দেবো—

—সবুজ শাড়ি, শিউলি পাতার রং, বুঝলে?

—কার কাছে দেখলে?

—ওই রাণাঘাটের পিসিমা এসেচেন ও বাড়িতে। তাঁর ছেলের বৌ।

—বেশ।

—দেবে তো?

—কেন দেবো না?

নিরুপমা বুঝেও অবুঝের মতো অনেক সময়ে বলে ছেলেমানুষের মতো (বয়সও অবিশ্যি এই পঁচিশ), তাতে আমার বড় মায়া হয়। ভাবি কখনো যদি হাতে একসঙ্গে কুড়িটা টাকাও পাই, তবে নিরুর রঙিন শাড়ি আগে দেবো এনে।

সেবার বড্ড আশা হয়েছিল যে এবার বোধ হয় নিরুর কাপড় একখানা দিতে পারবো।

দিগম্বর নন্দী এসে বল্লে—পণ্ডিত মশাই, একটা ছেলের হাত দেখে দেবেন?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী না শুধু হাত?

—ঠিকুজি কুষ্ঠী করে দিতি পারবেন?

—বলে ওই করতে করতে চুল পাকবো-পাকবো হোল, হয় না হয় তোমাদের পাড়ার পঞ্চানন বিশ্বেসকে জিগ্যেস—

—জিগ্যেস আর কত্তি হবে না পণ্ডিত মশাই, কত লাগবে তাই শুনি?

—কুড়ি টাকার কমে হবে না। ছেলেটা কে?

—আমার বড় সম্বন্ধীর ছেলে। আমার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন হবে সামনের বুধবারে, তাতে ওরা সব আসচে কিনা—

—তুমি তোমার ছোটো ছেলের একখানা ঠিকুজি এই সময় তৈরি করে নাও না কেন? এই সময় করাই ভালো—সস্তায় করে দেবো, পাঁচটা টাকা দিয়ো।

দিগম্বর নন্দী বড় চাষিগৃহস্থ। সে রাজি হয়েই চলে গেল, মনে মনে ভাবলাম নিরুর রঙিন শাড়ি এবার হয়েই গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর সম্বন্ধীর সে ছেলে এলই না। দিগম্বরের ছেলের ঠিকুজি তৈরি করে পাঁচটা টাকা পেয়েছিলাম অবিশ্যি।

রহমান ডাক্তার এ অঞ্চলের মধ্যে পসারওয়ালা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ফী নেয় একটাকা করে। নিরুর অসুখ কিছুতেই যখন সারে না, তখন তাকে ডাকলাম। রহমান ডাক্তার ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখে। আমার উঠানে নেমে বল্লে—মাস্টারমশাই আছেন?

আমি সসম্ভ্রমে এগিয়ে নিয়ে এলাম।

—কি অসুখ? কার? মা ঠাকরুনের?

—হ্যাঁ, আসুন। দেখুন দিকি ভালো করে।

—আপনার সংসারে আর লোক নেই?

—না, তাতেই তো—

—তাই তো! কতদিন অসুখ?

—হোল আজ দু'হপ্তা।

রহমান ডাক্তার দেখে-শুনে চব্বিশ রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে ওষুধ দিয়ে গেল। ভালো লোক,ভিজিটের টাকা নিতে চাইলে না আমার কাছে। বল্লে—ও কি? টাকা? না থাক থাক—আপনি দেবেন না—

—না নিতে হবে।

—তা কখনো হয়? আমার ছেলেটা পড়ে আপনার স্কুলে। আপনি তার মাস্টারমশায়। টাকা দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ নয় এখানে! তার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন দয়া করে। ওষুধটা আনিয়ে নিন আমার ডাক্তারখানা থেকে। বেদানার রস খেতে দেবেন। গ্লুকোজ আনিয়ে নিন একটা।

স্কুল থেকে টাকা হাওলাত নিলাম পাঁচটা। ওষুধ জিনিসপত্র সব আনাই বাজার থেকে।

নিরু নাকিসুরে বল্লে—আঁমি বাঁর্লি খাবো নাঁ—

—খাও লক্ষ্মীটি। খেতে হয়—

—আমি ওঁ খেঁতে পাঁরি নে—

—না খেলে কি জ্বর ছাড়ে? খেয়ে নাও—

—আঁমাকে সন্দেশ কিনে দেবে? সন্দেশ খাঁবো—

—সেরে ওঠো। দেবো বই কি। নিশ্চয় দেবো—

—দেঁবে ঠিঁক?

—দেবো, ঠিক দেবো।

সব জিনিসই ওকে বলি দেবো দেবো। না পারি ভালো একখানা শাড়ি দিতে, না পারি ব্লাউজ দিতে, না কখনো পারি কিছু ভালো খাওয়াতে। মনে পড়লো একবার পাশের বাড়ির সনাতন রায় খাসি কেটে ভাগ দিচ্ছিলেন, আড়াই টাকা সের। ওদের বাড়ির বড় খাসিটা, চব্বিশ সের মাংস হয়েছিল। নিরু বল্লে—হ্যাঁগা, মাংস নেবে? বটঠাকুরদের বাড়ি দিচ্ছে। কদ্দিন মাংস খাইনি—নিয়ে এসো না একটু। একপোয়া নিয়ে এসো গিয়ে। বেশি দামের মাংস, ওর বেশি আর নিতে পারবো না। দুজনে ওই খাবো এখন—তুমি নিয়ে এসো—আমি বাটনা বেটে রাখি—

কিন্তু ওরা একপোয়া মাংসের খদ্দের শুনে নাক সেঁটকালে। অন্তত এক সের নিতেই হবে। অত বড় খাসি একপোয়া আধপোয়া করে ভাগ করতে হলে চলে না। দেড়সের দু'সের মাংসের খদ্দেররা সব কচুর পাতা কলার পাতা হাতে করে বসে আছে।

সেবার নিরুকে এসে বলেছিলাম—তুমি ভেবো না, ইস্কুলের ওদিক থেকে মাংসের ভাগ যদি পাই, একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবে তো?

—ঠিক আনবো। এই মাসের মধ্যিই—

সে আজ ছ'মাস হয়ে গেল। মাংস আনাও হয়নি,ওকে খাওয়ানোও হয়নি।

রাত্রে নিরুপমা জ্বরের ঘোরে ভুল বকে যখন, তখন কেবল এই কথাই মনে হয়, ও একদিন মাংস খেতে চেয়েছিল,ওকে খাওয়ানো হয়নি! ও কতদিন একখানা রঙিন শাড়ি চেয়েছিল,ওকে কিনে দেওয়া হয়নি। যদি ও না বাঁচে? তবে ওর এইসব কথা কোথায় লেখা থাকবে?

রাত্রে কেউ থাকে না বাড়িতে। আমি নিরুর বিছানায় পাশে একা বসে আছি। রাত্রে অনেক সময় মানুষ চিনতে পারে না। ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলে—'কে? বসে কে? কে গো ওখানে?'আমি ওকে পাখার হাওয়া দিই, মাথায় জলপটি লাগাই, গ্লুকোজের জল খাওয়াই। বসে বসে ভাবি কাল জগন্নাথ বক্সিদের বাড়ি গিয়ে জানাব আমার দুঃখু। রাত্রে একা থাকতে পারিনে রুগী নিয়ে। কোনো একটা সাহস পাইনে। তার ওপর মন হু-হু করে, যেন কান্না আসে। অনেক রাত্রে একটু ঢুলুনি এসেচে, কখন ঘুমিয়ে পড়েচি জানি না। ঘুম ভাঙলো কি একটা শব্দ শুনে। ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি নিরুপমা বিছানায় নেই—ঘরের দোর খোলা। ছুটে রোয়াক গিয়ে দেখি নিরু টলতে টলতে রোয়াক পার হয়ে পৈঠেতে নামতে যাচ্চে। আমি খপ করে ওর হাত ধরে বল্লাম—এসো এসো—যাচ্চ কোথায় ?

নিরুপমা চিৎকার করে গান জুড়ে দিল—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে

তোমার শাওড়ি বলে দিয়েচে বেগুন

কোটোসে—

আমি বল্লাম—ও নিরু, ছিঃ—ওরকম চেঁচিও না, চেঁচাতে নেই, ঘরের মধ্যে এসো—

নিরু ধপ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়লো। জ্ঞানকাণ্ড নেই, এলোমেলো অবস্থা কাপড়-চোপড়ের। আমি অনেক করে বুঝিয়ে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দিলাম। এমন দুঃখ হোলো মনে, গরিব বলে কি কেউ এতবড় বিপদে অমনি দেখে না?

কাল বক্সিদের বাড়ি গিয়ে সব খুলে বলবো, দেখি যদি ওদের দয়া হয়!

রাত্রি কোনো রকমে কাটলো। খানিক পরে পূর্বদিক ফরসা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বক্সিদের বাড়ি গিয়ে বিপদ জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করার মতলব আমার কোথায় মিলিয়ে গেল। সঙ্কোচ হয় বলতে, ও আমি পারবো না। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমাদের মতো গরিবের তিনিই অবলম্বন।

রহমান ডাক্তার সকালে এলে আমি রাত্রের ঘটনা বল্লাম।

ডাক্তার বল্লে—হাই ফিভার হয়েছিল—তাই অমন করছিলেন। মাথায় জল দিলেন না কেন? রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন। আর নার্সিং যেন ভালো হয়—উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবেন না।বেডপ্যান একটা পাঠিয়ে দেবো এখন আমার কমপাউন্ডারের হাতে।

একাই ওষুধ দিই, একাই বাতাস করি, একাই বেডপ্যান ধরি।

আহা, মিথ্যে কথা বলবো না। পরদিন ঘাটে নাইতে গিয়ে মুখুজ্যেপাড়ার ঘাটের পাড়ের উঁচু জঙ্গলে ওল তুলচি শাবল দিয়ে,জীবন মুখুজ্যের বড় মেয়ে আশালতা বল্লে— কে, কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা। ওল তুলচি একটা। পাতা বেশ হলদে হয়ে এসেচে, বড় ওলটা।

—কাকিমার অসুখ নাকি কাকাবাবু?

—হ্যাঁ মা,বড্ড কষ্ট হচ্চে।

—দেখাশুনা করচে কে?

—আমি। আর কে করবে?

আশা বল্লে—আহাহা, একা আপনি? রাত্রেও? আপনার তো বড্ড কষ্ট হচ্চে, মেয়েমানুষের ওষুধের নার্সিং কি পুরুষ দিয়ে হয়? আমায় যে যেতে দেবে না কাকাবাবু। গেলে পাঁচটা কথা ওঠাবে। গাঁ যে কি রকম তা তো জানেন। নইলে আমি রাত্রে আপনাদের বাড়ি যেতাম কাকাবাবু—জাগতাম সারারাত—

—না মা, বেঁচে থাকো। ভালো হোক। যেতে হবে না, মুখে বল্লে এই যথেষ্ট মা। ভালো হোক তোমার, ভালো হোক।

ওল তুলে জলে নামতে নামতে বল্লাম। আশালতা সিক্ত-বস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। ইচ্ছা ওর, আরো কিছু বলে। আমি বল্লাম—না,তুমি যাও—

—কাকাবাবু, দিনমানে কাকিমার কাছে কে থাকে ?

—কেউ না মা। তবে দিনমানে সে ভালো থাকে। একরকম। জ্বরের বাড় রাত্তিরে—

সেই দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আশা নিরুপমার বিছানায় বসে বাতাস করচে ওকে। বড় ভালো লেগেছিল আমার। বড়লোক না হলেও ওর বাবা জীবন মুখুজ্যে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর মেয়ে এসেচে আমার মতো দরিদ্র স্কুলমাস্টারের স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। বেশ লাগলো। তারপর আশা আমায় চা করে দিলে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে।

—খাবার কিছু নেই কাকাবাবু?

—খাবার? আমি তো কিছু খাইনে মা এসময়—

—দাঁড়ান, আসচি—

বলেই ও চলে গেল এবং একটু পরেই একবাটি মুড়ি ও আধখানা কাটা শসার ফালি আঁচলে ঢেকে নিয়ে এসে বাড়ি ঢুকলো।

—খান কাকাবাবু।

—এ মা তোমার অনেয্য ব্যাপার।

—কিচ্ছু অনেয্য না। জল খান আপনি।

—ভালো হোক মা, তোমার ভালো হোক। তুমি চলে যাও এখন মা, আমি এসেচি, আমি দেখাশুনো করবো এখন।

গাঁ ভালো না। কে কি বলবে, সোমত্ত মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে আশা। তারপর আর ও আসেওনি। বোধ হয় আর ওকে আসতে দেয়নি ওর বাড়ির লোকে।

নিরুপমা সেরে উঠলো দিনদশেক পরে। ওকে ভাত রেঁধে খাইয়ে তবে ইস্কুলে যাই। আর এত লোভ বেড়ে গিয়েচে ওর—সারাদিন কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করে। অধিকাংশই কুপথ্য। কুপথ্যের মধ্যে দু-একটা যার নাম করে, তা কিনে দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত। আটা ময়দা কিছু নেই। মহকুমার সাপ্লাই অফিসারের কাছে একদিন গেলাম—নইলে ওকে কি খেতে দেবো রাত্রে? নিবারণ ময়রার দোকানে গেলুম কিছু খাবার কিনতে। এ অঞ্চলের ওস্তাদ কারিগর নিবারণ। রসগোল্লা, পানতুয়া, বরফি, সন্দেশ, জিলিপি যা তৈরি করে। আমি শহরে আসবো শুনে নিরুপমা বলে দিয়েচে চুপি-চুপি- খাবার এনো, বুঝলে? খাবার আনবে ভালো দেখে।

—কি খাবার খেতে ইচ্ছে হয়?

—যা তুমি ভালো বোঝো।

আমি সাজানো খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখলাম বড় কড়া থেকে নিবারণ ভালো সন্দেশ গড়চে। নিবারণের বিখ্যাত জোড়া সন্দেশ। বড্ড ইচ্ছে হোল নিরুপমার জন্যে জোড়া সন্দেশ নিয়ে যেতে। ও কখনো খায়নি সে। কি খুশিই হবে জোড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে গেলে!

পকেট খুঁজে দেখলাম। হাতে চার আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে খাবার কিনবার। তাতে মোটে হবে একখানা জোড়া সন্দেশ—আর বাকি থাকবে এক আনা।

দু-তিনবার খেয়েছিলাম। কি সুন্দর জোড়া সন্দেশগুলো!

নিরুপমার হাতে যদি দিতে পারতাম!

কিন্তু একখানা সন্দেশ নিয়ে যাওয়ার চাইতে এক পোয়া কুচো গজা নিয়ে যাওয়া ভালো। অনেকগুলো পাওয়া যাবে। মনের সাধ মনেই চেপে বল্লাম—কুচো গজা আছে? কত করে সের? দাও তিন ছটাক—বেশ টাটকা।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই নিরুপমা জিজ্ঞেস করলে—খাবার এনেচ? কি দেখি?

আমি হাসিমুখে পুঁটুলিটা দেখিয়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন অনেকখানি গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার এই পুঁটুলির মধ্যে সঞ্চিত।

নিরুপমা কৌতূহলের সঙ্গে বলে—ওর কি নাম?

নিবারণ ময়রার কুচো গজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়লাম আমি—এমন দেখিনি, এ জেলায় আর হয় না। বিখ্যাত কুচো গজা। নিবারণের কুচো গজা কলকাতা পর্যন্ত যায়। বড় বড় লোকে কিনে নিয়ে যাচ্চে। তবে বড্ড

দাম। পাওয়াই যায় না। যেমন কড়া থেকে নামে, অমনি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। অতি কষ্টে আধপোয়া সংগ্রহ করে এনেচি। খেয়ে দেখো।

নিরুপমা বলে—না, তুমি আগে দু'খানা খাও—আরো দু'খানা নাও না?

তারপর মহাখুশির সঙ্গে খেতে খেতে বলে—বাঃ সত্যি! কি চমৎকার জিনিস! ... না?...